নাস্তিক

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

অধ্যয়ন শেষ করে লোকনাথ যখন তার আচার্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য তাঁকে বলেছিলেন—একটা কথা সব সময় মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে "লোকনাথ" নামটি সার্থক করে জীবনের পথে অগ্রসর হবে ।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য দু'তিন দিন পর্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হয়ে লোকনাথ কোন বড় রাজসভায় গেলেন না। অধ্যাপনা করবার কোন আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ করে সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেলেন।

কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরবার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস করতে শুরু করলেন। এতে বেশির ভাগ লোকই তাঁকে বললে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যেদিন প্রভাতের আলো খুব ফুটত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা বেড়িয়ে বেড়াত, সমবয়সী অন্য কোন ছেলের সঙ্গে সে মিশত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরে ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মত দেখাত, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধরে মাঠের ধারের বনের কাছে বসে এক মনে কি ভাবত, তার অপলক শিশুনয়ন দু'টি দণ্ডের পর দণ্ড ধরে ও-পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাকত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। "আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চলে যাই, দূরে দূরে, ক্রমেই দূরে,—আরও দূরে,খুব খুব দূরে—খুব খুব খুব খুব দূরে—তা হলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব?' দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে–এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্তনশীল মেঘ রাজ্যের পেছনে, অনেক অনেক পেছনে সে কোন্ দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক, সে দেশের কথা মনে হতেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রামরাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলেছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ রাক্ষস এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আর আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা !

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে তাঁর আকৃতি দিন দিন লালিত্যহীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘচুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার বলে মনে হত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরনের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব হতেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য যাকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সূরিপদতিলক মহাচার্য জীবনসূরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজী না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করছেন। জৈব ধর্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দুখানা বহির্বাস তাকে দেওয়া হত। মাঠের ধারের বুনো কার্পাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত করে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ করে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময়ই দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারু-শ্রেণীর কালো ছায়া!

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি করে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত—ষড়দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি মেঝেতে এমন যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ানো পড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক-একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণ ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে পড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ করে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না যে, কেন তিনি এতক্ষণ মনে মনে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করছিলেন।

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি ? প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন, নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফটিক পিণ্ড বলে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতিক রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত পড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তার একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধরে বহু পরিশ্রম করে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ করে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষ্য তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একখণ্ড ইটের মতই সেখানা সেই মুহূর্তে ডুবে গেল, শুধু সাংখ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সংঘাতে বন্য নদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন দিন হারাতে লাগলেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে ধারে সারা দিনমান ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বলজ্বল করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে

দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত । ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোাকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার যে সহজ উপায় দার্শনিকরা নিরূপণ করে গিয়েছেন, পড়ে শুনে দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে ! রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জপত্রের পতঞ্জলি বক্রচক্ষে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মূর্খগুলোর সঙ্গে এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ করে লোকনাথের মনে হত অর্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে পরস্পর মহা তর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারগণের বাগ্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার পাহাড় গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হত না, পুরাতন ভূর্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোন দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীটপতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত....নদীর ঝির্‌ঝিরে ঠান্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধরে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ ? স্বয়ম্ভূ ?....সৃষ্টির পূর্বের জিনিস ?

লোকনাথ আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙ্গুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সেদিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্বদাই আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চলে যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর মনে হত কোন কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন....'পেয়েছি....পেয়েছি....'। তাঁর মনে হল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু হু করে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিতপ্রদীপ কুটীরে একা বসে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পস্পৃষ্টের মতন শিউরে উঠেছিল,....পুঁথি বন্ধ করে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে শিউরে উঠেছে। এখন তাঁর সে কথা মনে পড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুকস্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারে না— যে বলে জেনেছি, হয় সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক মূর্খ ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া লক্ষ্মীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আস্‌বো....পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশী নেবে ? বড় জোর সাত বছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশি কি আর থাকতে পারব ? বুঝলে ?

সতেরো বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে—সাত বচ্ছর....এত কম সময় ? এ আর এমন বেশি কি ?

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাত বছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে ? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—নয় কি, মায়া ?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়— নাঃ তা আর বেশি কি ! মোটে সাত বছর—এবেলা ওবেলা—ব'লেই প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি না—আমার বল্‌বার কথা....

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তার কোন আসক্তি ছিল না। মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত শুরু হল ;সে এক অন্যজগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে সেখানে শুধু এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক....কে তুচ্ছ মায়া, মূর্খই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায়, হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্ত যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জা-নম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষ্মীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন,মায়া বিবাহ করেনি, কোন্ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক দিনের কথা, তারপর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই,এই কার্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কিনা। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনবার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে তো জানিও।....ভোলাবার চেষ্টা কোরো না,তাতে আমি ভুলব না।'

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিকপন্থী মাধবাচার্য বাস করতেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি কি, মুক্তি কয় প্রকার, মুক্তির ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কিনা, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রিয় হলেও তাঁর মনে হতে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে করতে একদিন তাঁর মনে হ'ল তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপরে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা গাছ,-এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি, ভাল করে চোখ পড়তে দেখলেন যে, শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় করে ঠেকেছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন—কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হলে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্য দিয়ে বেশ কেটে চলে যায়, যখন যেদিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সেদিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান করে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়েছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল ? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন করে গড়লে ?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্বে তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে ?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হল যে তিনি এ কথা জোর করে মন থেকে দূর করে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে ভেতরে দিন দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুক্‌নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই পড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার স্রোতের জলে ঝুপসি হয়ে পড়ে থাকত, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো করে থাকত, পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত, লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেই সব স্থানে কি দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনের মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো কুচো সাদা ফুল রাশি রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি করে পাপড়ি মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ওখান থেকে ফুল তুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা করে পাপড়ি, মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তার মনে আসে—অসাধারণ ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য ! লোকনাথ বলতেন—জানাও হে চৈতন্যময় কারণ-শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিনকতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হতে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ দ্বারপার্শ্বের সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তার চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছটফট করতে লাগল । রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন--চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি, চোখ খুলে দাও।

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গকে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে অল্পে অচেতন করে ফেলছে, বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ করে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটায় শুঁড়ের মত ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ। ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হয়ে ঐ ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।.....

লোকনাথের মন একমুহূর্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন । মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর ?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ্বলে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মত তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড় বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব দিক্‌চক্রবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তার ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু করে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হ'ল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠার মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দুটো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হ'ল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হ'ল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ....মাঠের ইতস্তত শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে পড়ল না...হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে বলে তাঁর মনে হ'ল । বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠছে....লোকনাথ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন—কুসুম ফুলের বীজ,

রক্তচন্দনের ছাল, ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই। এদিক ওদিক খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোলে তিনি বসে পড়লেন—অসহ্য দংশনবিষে তাঁর সর্বাঙ্গ তখন ঝিমঝিম করছে ।....

ধীরে ধীরে তার মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল.....আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্মল করাল রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে....তোমার পাষাণকারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব....

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন সুদূরতম, অপ্রকল্প রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছ ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে ?....সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান, সর্বভূতের অপেক্ষা মহান....মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য। তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও ? বেশ, তা হলে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, দেব, অন্ধ রাজ্যের পারে, ওই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।....কোথায় তোমার চির-বিকশিত জ্যোতিঃ-প্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞান-সম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব....

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে বলে উঠল, তোমার বিচারশক্তি চলে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার ? মনের এই তরল ভাব দুর্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর করে দাও....

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না....আফিমের নেশার মত মরণের তন্দ্রা তার ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল...

কোথায় কোন দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে....সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পা-গুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে....ওধারে তারা দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে....

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভালো রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, দেখ তুমি খেয়ে....

নীলব্যোমপথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু সমিধবাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করছেন—ওহে সঙ্গীগণ, আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্বার নূতন জল সংগ্রহ করি....এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি....তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালি-গোলার মতো কি ঝ'রে পড়ছে ।

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে ? কেন আমায় মারবে তুমি ?....এ পাড়ায় আসি বলে ?....আর কক্‌খনো আসব না....দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি....

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশু-নয়ন দুটি যে ভাবে আবদ্ধ রইত....প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল....প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছে পাওয়া গেল না.....